পাঁচ বছরে বিরোধী দলের সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

সাধারনতঃ ক্ষমতাশীন দল, তার নেতা-নেত্রী ও মন্ত্রীদের সাফল্য ব্যর্থতার বিষয় আলোচনা করা হয়। তার সঙ্গত কারণও রয়েছে। তাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে, প্রশাসন থাকে, থাকে জনগনের অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রে, রাষ্ট্র পরিচালনায় বিরোধী দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিরোধী দলীয় নেতা একজন মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করেন। সংসদেও বিরোধী দলীয় নেতার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটিগুলো যথেষ্ঠ ক্ষমতাবান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিরোধী দলের প্রভাব আরও বেশী। গত নির্বাচনে দলটি এককভাবে চল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছিল যা ক্ষমতাশীন দলটির এককভাবে প্রাপ্ত ভোট থেকে বেশী। দলটির প্রতি দেশের পেশাজীবি, ব্যবসায়ী ও মিডিয়ার সমর্থন অন্য যে কোন দলের তুলনায় অনেক বেশী। ফলে ক্ষমতার বাইরে থাকলেও দেশ কিভাবে চলবে তা পরোক্ষভাবে নির্ধারণে দলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গত পাঁচ বছরে প্রধান বিরোধী দলের সবথেকে বড় সাফল্য হচ্ছে সরকারী দল ও জোটকে অব্যাহত চাপের মধ্যে রেখে সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহার রোধ করা। বাংলাদেশে এ ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। স্বাধীনতার পরপরই এরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে দেশে গণতন্ত্র হত্যা করে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত; কেননা, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামই এক পর্যায়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। সারা জীবন গণতন্ত্রের সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিটি এ ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাবে গণতন্ত্র হত্যার মত পদক্ষেপ নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকারকে এ ধরণের কোন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়নি। এমনকি আইন করে হরতাল বন্ধ করার মত জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপের কথা দলটির শীর্ষ নেতারা বললেও তা করতে সাহস পাননি শক্তিশালী বিরোধী দলের কারণেই।

তবে সরকারকে চাপের মুখে রাখতে বিরোধী দল যে সকল কৌশল অবলম্বন করে এসেছে সেগুলি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০০১ এর নির্বাচনের পরপরই বিরোধী দল তা প্রত্যাখান করে এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল শপথও নিবে না সংসদেও যাবে না। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নেন এবং সংসদে যোগ দেন। এ সময় দলটির পক্ষ থেকে বিদেশে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে। সে প্রচারণায় সরকারী দল যথেষ্ঠ চাপের মুখে পড়েছিল বটে, কিন্তু প্রবাসী বাংলাদেশীরা এর কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ ক্রমাগত গনবিচ্ছিন্নতার কারণে দলটি রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলতেও তেমন সফল হয়নি। এ ক্ষেত্রে দলটির অনুসৃত কৌশল দেশের ভিতরে বাহিরে সমালোচিত হয়েছে। রাজপথে অন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে দলটি এমন সব কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে যাকে অনেকেই প্রতারণামূলক মনে করেছেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালিন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস পর্যন্ত বলেছিলেন, ‘হরতাল

সমাবেশস্থলে পুলিশ আসার আগেই অনেক সময় মহিলারা বিবস্ত্র হবার ভান করে কিংবা সাংঘাতিকভাবে নিগৃহীত হবার অভিনয় করে।'

ভুল কৌশল, উগ্রতা, জনগনকে জিম্মি করে রাখার প্রবণতা ও অস্বচ্ছ রাজনীতির কারণে দলটির নেতা-কর্মীরা যখন গণবিছিন্ন হয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল তখন হঠাৎ করেই দলটির মহাসচিব ঘোষণা দেন যে, ৩০শে এপ্রিল (২০০৪) সরকারের পতন হবে। বাংলাদেশ তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসেও সম্ভবতঃ একটি নির্বাচিত সরকারকে এভাবে দিন-তারিখ বেঁধে দিয়ে পতনের ঘোষণা বিরল। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করতে থাকেন। দলটির কট্টর সমর্থক বুদ্ধিজীবিদের কেউ কেউ পর্যন্ত বিরোধী দলের মহাসচিবকে তাসারু, গাজাখোর ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেত থাকেন। কিন্তু তিনি তাঁর বক্তব্যে অনড় থাকেন এবং দলীয় প্রধানও এ বিষয়ে সমর্থনসূচক বক্তব্য দেন।

৩০শে এপ্রিল চলে যায়, কিন্তু জোট বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থাকে। এরই মধ্যে এসে যায় দলটির শোক ও আবেগের মাস আগস্ট। ১৫ই আগস্টের সকল কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও ২১শে আগস্ট দলীয় প্রধানের সমাবেশ লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। তিনি অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও একজন কেন্দ্রীয় নেতা সহ অনেকে নিহত হন। সারা জাতি হামলাকারীদের প্রতি নিন্দায়, ধিক্কারে ও বিরোধী দলের প্রতি সহানুভূতিতে সোচ্চার হয়। কিন্তু বিরোধী দলের ভুল কৌশলের কারণে সহানুভূতি শেষ পর্যন্ত সন্দেহে রূপান্তরিত হয়। তারা এ হামলার জন্য সরাসরি সরকারের দায়ী করে তার পদত্যাগ দাবী করেন। বিরোধী দলীয় নেত্রীর গাড়িটি পরীক্ষার জন্য বার বার চাওয়া হলেও তা পরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয়নি। বিরোধী নেতৃবৃন্দ দেশীয় গোয়েন্দাদের সাথে তদন্ত কার্যে কোনরকম সহায়তা তো করেনই নাই, উপরন্তু যখন খবর বের হয় যে, এফবিআই ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা আসছে, তখন দলটির প্রথম সারির নেতারা দল বেধে ইন্ডিয়ায় পাড়ি জমান চিকিৎসার অযুহাতে। এ সকল কারণে ঘটনার সাথে বিরোধী দলের একাংশের জড়িত থাকার গুজব অনেকেই বিশ্বাস করতে শুরু করে। পরবর্তীতে গ্রেনেড হামলায় অংশ নেয়ার কথা স্বীকার করে জর্জ নামে একজন শীর্ষ সন্ত্রাসী। সে জানায় যে, তার বড়ভাইদের কঠোর নির্দেশ ছিল যে, কোন গ্রেনেড যেন বিরোধী দলীয় নেত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বহনকারী ট্রাকে না পড়ে। এসকল কারণে এই নির্মম হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে তেমন কোন আন্দোলন বিরোধী দল গড়ে তুলতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটে ভাবে কিবরিয়া হত্যাকান্ডের ব্যাপারেও ।

এর মধ্যে সরকার বিচারপতিগণের চাকুরীর বয়স বৃদ্ধির বিল পাশ করে। সরকার যে নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে চাইছে তা এর মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ে । কিন্তু বিরোধী দল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দাবীসহ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। বরং তারা সরকারের পদত্যাগ দাবী করতে থাকে। সাথে শর্ত জুড়ে দেয় যে, সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যাক্তিকে তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। এ বিষয়টি তাদের পুরো সংস্কার প্রস্তাবকে অবাস্তব করে তোলে এবং জনমনে এ ধারণা জন্মে যে তারা আসলে সংস্কার চায় না, বরং আন্দোলনের ইস্যু বানাতে এ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তীব্র রাজনৈতিক বিভক্তির এ দেশে সকল দলের নিকট গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যে কতটা অসম্ভব তা সকলেই বুঝতে পারে। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মেদ, যিনি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের ভাইএর শ্বশুর, তাঁকে দলটি তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ভেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আওয়ামীলীগ সব সময়ই উচ্চকণ্ঠ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে চারদলীয় জোট জয়লাভ করার তাঁকে বিশ্বাসঘাতক, বিএনপির দালাল ইত্যাদি বলে গালি দেন

স্বয়ং বিরোধী দলীয় নেত্রী। এ সকল কারণে সরকারী দলের পক্ষে জনগনকে বোঝানো সহজ হয় যে, বিরোধী দল প্রকৃতপক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না, বরং নির্বাচন বর্জন ও দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির অযুহাত খুঁজছে।

২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট যখন বাংলাদেশের একটি বাদে সকল জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা হামলা হয় তখন হতভম্ব হয়ে পড়ে বাংলাদেশ। ১৭ই আগস্টের সিরিজ হামলার রেশ কাটতে না কাটতে একের পর এক আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু হলে জাতি দিশেহারা হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের জন্য সময়টা ছিল জাতির ইতিহাসের সবথেকে ক্রান্তিকাল। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর না আছে আধুনিক সরঞ্জাম, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর না আছে নৈতিক মান। পুলিশ বিভাগ সরকারের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্থ অঙ্গগুলোর একটি। তাদের দুর্নীতি এতো বেশী প্রকাশ্য ও বিস্তৃত এবং দুর্নীতির শিকড় এতো বেশী গভীরে প্রোথিত যে প্রায়শঃ এ বাহিনীর সদস্যদেরকে চুরি ডাকাতিতে লিপ্ত হতে দেখা যায়। অপরদিকে পনের কোটি অনুপাতে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম। নাগরিক পরিচয়পত্রের মত কোন কিছু না থাকার কারণে অপরাধ সংঘঠিত করে খুব সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এরকম একটি পরিস্থিতিতে যখন একদল লোক নিজেদেরে শরীরে বোমা বেঁধে বিচারকের এজলাস, জনাকীর্ণ প্রশাসনিক দফতর ইত্যাদিতে ঝাপিয়ে পড়তে শুরু করলো তখন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে বললেন যে, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে আত্মঘাতি হামলা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। সরকার এতো অসহার মধ্যে পড়লো যে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে বিরোধী দলকে সংলাপে আহবান জানালো।

প্রধানমন্ত্রী যখন জাতীয় সংলাপের ডাক দেন তখন প্রায় সকল মহল থেকেই জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গীদের মোকাবেলা করার কথা বলা হচ্ছিল। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল জাতীয় ঐক্য ও সংলাপের প্রস্তাব রুঢ়ভাবে প্রত্যাখান করে। বিরোধীদলীয় নেত্রী এ সকল বোমাবাজির জন্য সরাসরি সরকার ও সরকারী দলগুলোকে দায়ী করেন এবং বলেন যে, সরকার পদত্যাগ করলেই জঙ্গী হামলা বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন। যাঁরা ইতোপূর্বে জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছিলেন তাঁদের অনেকেই ঐক্যের বিষয়টি থেকে সরে এসে বিষয়টি থেকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ডঃ কামাল হোসেন বললেন যে, জোটের শরিক বৃহৎ ইসলামি দলটিকে সরকার ও জোট থেকে বাদ দিলে জঙ্গী তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে। সাংবাদিকদের সংলাপ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন যে সংলাপে যা বলার তা তিনি এখনই বলে দিচ্ছেন। পর দিন তিনি বললেন যে, সংলাপে বসে চা খাওয়া তাঁর কাছে অর্থহীন। বিরোধীদলের সমর্থক পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলো এ সুযোগে সকল দোষ জোটের ইসলামপন্থী দলগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে জোটে ভাঙ্গন ধরাতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

বিরোধীদলের কৌশল এ পর্যায়ে কিছুটা সফল হতে থাকে। সরকারী দলের সিনিয়র নেতাদের কেউ কেউ, যারা মন্ত্রীত্ব পাননি এবং এ মেয়াদে আর পাবার কোন সম্ভাবনা নেই, টিভি চ্যানেল ও পত্র-পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে বিরোধী দরের সুরে কথা বলতে থাকেন। এমনকি দু-একজন মন্ত্রীও তাদের সাথে শরীক হন। বাতাসে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে জোট ভেঙ্গে যাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অবস্থানের কারণে জোট টিকে থাকে। এক পর্যায়ে যখন একে একে জঙ্গী নেতাদের পাকড়াও করা হতে থাকে তখন বিরোধী দল থেকে তাকে নাটক হিসাবে অভিহিত করা হয়। ইতোমধ্যে শীর্ষ জঙ্গীদের ফাঁসির আদের দেয়া হয়েছে। এ সরকারের আমলেই হয়তো তাদের ফাঁসি হয়ে যাবে। যখন বলা হয় যে, আওয়ামী

লীগের আমলে জঙ্গী উত্থান শুরু হলেও তারা তাদের দমনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি, অপর দিকে বিএনপি জঙ্গীদের ফাঁসি দিচ্ছে তখন তা বিরোধী দলের বিপক্ষেই যা এবং তাদের কিছুই বলার থাকে না।

জঙ্গী দমনে প্রাথমিক সাফল্য আসার পর সরকারের উপর বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে প্রভাবশালী বিদেশী মহলগুলো থেকে চাপ আসতে থাকে। সে চাপ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী সংসদ থেকে বিরোধী দলকে সংলাপের আহ্বান জানান। এটি ছিল সরকারী দলের একটি ফাঁদ এবং বিরোধী দল তাতে পা দেয়। দলটি সংলাপের সাথে এমন একটি শর্ত জুড়ে দেয় যা পূরণ ছিল সরকারী জোটের জন্য আত্মঘাতিমূলক। তারা শর্ত দেয় যে জামায়াতকে সংলাপে রাখা যাবে না। এ শর্তটি যুক্তিযুক্ত ছিল না কেননা দলটির সাথে আওয়ামী লীগ একত্রে আন্দোলন করেছে এবং সংসদীয় কমিটি সহ বিভিন্ন ফোরামে একসাথে অংশ নিয়েছে। এমনকি পরবর্তীতে একজন বিদেশীর ডাকে তারা জামায়াতের সাথে আলোচনায় বসেছে। তাছাড়া সংলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন ব্যবস্থা। যারা জোটের শরীকদেরকে আলোচনার জন্যই গ্রহণ করতে পারছে না, তারা কিভাবে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা ও কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা খুঁজে বের করবে? এসকল কারণে বলা হচ্ছিল যে তাদের অঅসল উদ্দেশ্য সংলাপ নয়, সরকারী জোটে ভাঙ্গন ধরানো। সকলেই বুঝতে পারছিল যে বিএনপি যদি জামায়াতকে বাদ দিয়ে সংলাপে যায় তাহলে জামায়াতের সাথে দলটির দূরত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টা সফল হবে। বিরোধী দলীয় নেত্রী পরদিনই তাঁর স্বভাব সুলভ ভাষায় জামায়াতকে আক্রমণ করবেন এবং এমন কথা বলবেন যাতে মনে হবে যে বিএনপি জামায়াতকে পরিত্যাগ করেছে। অপরদিকে সংলাপ অনুষ্ঠিত হলে সংস্কারের যৌক্তিক দাবীগুলি মানা ছাড়া সরকারী দলের গত্যন্তর থাকতো না। সংলাপের বিষয়ে দেশের সাধারণ মানুষ, মিডিয়া, ব্যবসায়ী মহল, সুশীল সমাজ হিসাবে পরিচয় দানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও বিরোধী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল কয়েকটি পশ্চিমা দেশ সকলেই আগ্রহী ছিল। সংলাপ হলে যেমন নির্বাচন ব্যবস্থায় যৌক্তিক সংস্কার সমূহ সরকারকে গ্রহণ করতে হতো তেমনি এটিকে বিরোধী দল তাদের বিজয় হিসাবে দেখাতে পারতো।

সংলাপের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেলেও বিরোধী দল নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বাহ্যতঃ সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন সংস্কারের দাবীতে আয়োজিত পদযাত্রাগুলো পরিণত হতে থাকে নির্বাচনী শো ডাউনে। বিরোধী দল থেকে বলা হতে থাকলো যে এরশাদ ও কয়েকটি ধর্ম ভিত্তিক দল নিয়ে তারা মহাজোট গঠন করবেন। রাজধানী সহ সারা দেশ দলীয় টিকেট প্রার্থীদের পোস্টার ও দেয়াল লিখনে ছেয়ে যায়। এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় খবর বের হল যে এরশাদের সাথে তারেক জিয়ার বৈঠক হয়েছে এবং এরশাদ চারদলে যোগদানের বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছেন। সাথে সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রী এরশাদকে চোর সম্মোধন করলেন এবং সংস্কার ছাড়া নির্বাচনে না যাবার ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

এ ধরণের একের পর এক ভুল ও অস্বচ্ছ রাজনৈতিক কৌশলের কারণে গত পাঁচ বছরে বিরোধী দল একদিকে যেমন কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি, তেমনি জনগণের আস্থাও অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের একটি বড় অংশের ভীতির কারণে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল বিএনপি বার বার ক্ষমতায় আসতে পারে। সে ভীতি দূর করে জনগণের আস্থা অর্জনে দলটি সফল হতে পারেনি। বরং গার্মেন্টস শিল্পে ধ্বংস যজ্ঞের পিছনে তাদের একটি মহলের ভূমিকা ছিল বলে অনেকেই সন্দেহ করেছেন। অপরদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারেও দলটির কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়নি।

সরকারের চারবছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেল থেকে বিরোধী দলের মহাসচিবকে চারবছরে তাঁর দলের ব্যর্থতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, সরকার যে তখন পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল - এটাই তাদের সবথেকে বড় ব্যর্থতা। তখন একজন মন্তব্য করেছিলেন, একটি গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দলের ভূমিকা কি হবে তা বুঝতে না পারাই আসলে বিরোধী দলের সব থেকে বড় ব্যর্থতা। দলটি যদি সব কিছুর সাথে সরকার পতন যোগ না করে জনগণের ইস্যুগুলো নিয়ে আন্দোলন করতো, তাহলে পরাজয়ের ভয়ে তাদেরকে এখন নির্বাচন বর্জনের পথ খুঁজতে হতো না।